# শিবপুরের মুখার্জি পরিবারের গৃহদেবী

পূর্বা সেনগুপ্ত

সেকেন্ড ব্রিজ ছাড়িয়ে শিবপুরের মন্দিরতলা স্টপেজ পৌঁছতে আজ পাঁচ মিনিটও লাগে না। কিন্তু কিছুদিন আগেও শিবপুর যে গঙ্গার ওপার তা ভালভাবেই বোঝা যেত। শোনা যায়, মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হলে শাসক ইংরেজদের উপর তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় কলকাতার ব্রাহ্মণশ্রেণির। নব্য কলকাতার সমাজব্যবস্থায় তখন নতুন ধনীর উত্থানের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ধনমর্যাদা নয়, বংশমর্যাদায়, জাতিমর্যাদায় ব্রাহ্মণই তখনও শ্রেষ্ঠ! তারাই সমাজের মাথা! তাদের উপস্থিতিতে এতবড় একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত বিদেশি শাসকশ্রেণি গ্রহণ করবে! এ ছিল অসহ্য। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, ব্রাহ্মণের মর্যাদা বিদেশি জানে না, তাই একদল ব্রাহ্মণ দুষ্ট শাসকের শাসনকে উপেক্ষা করে, তার প্রতিবাদ স্বরূপ কলকাতা নগরী ত্যাগ করে গঙ্গার ওপারে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। ওই নতুন বসতিই শিবপুর। আজও এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অন্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। মন্দিরতলা দিয়ে শিবপুর রোড ধরে একটু এগোলেই একটি শিবমন্দির চোখে পড়বে। এটিই হয়তো 'শিবপুর' নামের উৎস। গঙ্গার ধারে মন্দিরও রমতা সাধুর আস্তানা হয়ে ওঠে। বর্তমানের গঙ্গা নয়, তৎকালে জলপথে গঙ্গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত, কলকারখানা আর চিমনির ধোঁয়ার পরিবর্তে সেখানে ঝোপ-জঙ্গল আর নীরবতা।

মন্দিরতলার বড় শিবমন্দির ছাড়িয়ে শিবপুর রোড ধরে একটু এগিয়ে গেলেই মুখার্জি পরিবারের প্রাচীন বাড়ি 'সুন্দরভবন'। এই পরিবার শিবপুরের আদি অধিবাসী নন। বেশ কয়েক পুরুষ আগে এঁরা ছিলেন চন্দননগরের গোদলপাড়ার অধিবাসী। চন্দননগর ফরাসি অধ্যুষিত অঞ্চল, ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করলে এঁদের এক শরিক রামকান্ত মুখার্জি নিজ পরিবার নিয়ে সেই রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে শিবপুর চলে আসেন। সেখানে তাঁর পরিচিত এক হালদার পরিবার তাঁকে শিবপুরে স্থায়ী বসবাসে সহায়তা করেন। তখন মুখার্জিরা হালদার পরিবারের যজমানি করতেন কিন্তু সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা পরিবারের বর্তমান সদস্যদের নেই। রামকান্তের বাসস্থান গঙ্গার কাছেই, তাই ঘাটে নেমে সাধু-সন্ন্যাসীরা সেই বাড়িতে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হতেন। রামকান্তের কোন দেবতা আরাধ্য

*সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ভারততত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার*

ছিলেন, কিংবা তিনি কোনও দেবতাকে নিয়ে মূল গৃহ থেকে শিবপুরে এসেছিলেন কী না—এ-তথ্যও এখন কেউ স্পষ্টভাবে বলতে অক্ষম। এই পরিবার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে রামকান্তের পুত্র রামসুন্দরের সময়। পরিবারে তখনই গৃহদেবীর শুভাগমন। রামসুন্দরের পাঁচ পুত্র। তিনি বড় বাড়ি তৈরি করেন, বাড়ির নাম রাখেন 'সুন্দরভবন'। চারিদিকে চকমেলানো বাড়িটির সদর দরজার দিকের পাঁচিলটি ছিল ফোর্টের মতো, খাঁজ কাটা। লোকে তাই বাড়িটির নাম দিয়েছিল 'ফোর্টবাড়ি'। এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। রামসুন্দর একদিন স্বপ্নে দেখলেন, এক দেবী তাঁকে নির্দিষ্ট একটি জায়গা দেখিয়ে বলছেন, ''এইখানে আমি বহুদিন ধরে পড়ে আছি।'' বাড়িতে ঢুকতে ডানদিকে বাড়ির লাগোয়া এক বিরাট পুকুর। বর্তমানে তার নাম 'বোলপুকুর'। ঘিঞ্জি জনবসতির মধ্যে এই বিরাট পুকুরটি দেখে বেশ আশ্চর্য লাগে। শোনা যায় অনেকবারই এই জলাশয় বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কোনওমতেই তা সম্ভব হয়নি। যিনি উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি হয় অসুস্থ হয়েছেন নয়তো অন্য কোনও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পুকুরপাড় ধরে এগোলে কচুবন। তারই ধারে রামসুন্দর পেলেন একটি অভূতপূর্ব জিনিস! মূর্তি নয়, পাথর নয়, একটি তামার টুকরো। চারকোণা এক ইঞ্চি বাই আড়াই ইঞ্চি একটি পুরু তামার পাতে খোদাই করা আছে দেবীযন্ত্র। তিনি মাথায় করে নিয়ে এসে দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে দেবী হলেন মুখার্জি পরিবারের গৃহদেবী। দেবীর নাম 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীহরি মাতাঠাকুরানি'।

দেবীযন্ত্র, উপরে দুটি চোখ

কথায় বলে 'যেখানেই বাঙালি, সেখানেই মা কালী।' বাংলার পাড়ায় পাড়ায় দেবী কালিকার মাটির বা পাথরের মূর্তি থাকে। দেবীর সম্মুখে কালীযন্ত্রের উপর পূজা করেন পূজক। কিন্তু দেবী কালিকা গৃহদেবীরূপে কোনও মূর্তিতে নয়, কেবল যন্ত্রে পূজিত হন—এ-ঘটনা খুবই বিরল। প্রশ্ন হতে পারে, যন্ত্রটি কেমন! তার বিশেষত্ব কী? কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিবারের অজ্ঞানতাবশত বা বহুকাল ধরে স্নান ইত্যাদি করাতে গিয়ে যন্ত্রটি প্রায় মুছে গিয়েছে। কোনও কোনও স্থানে রেখা ছিল—এটাই বোঝা দুঃসাধ্য।

দেবীর সঙ্গে মা লক্ষ্মীর একটি সংযোগ আছে। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন প্রতিবছর দেবীর বিশেষ পূজা হয়। সেদিন সন্ধেবেলা আগে বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়, তারপর দেবী নাটমন্দিরে আসেন ও মূল পূজা শুরু হয়। কালীপূজা সাধারণত বাড়ি কী বারোয়ারি সর্বত্র গভীর রাতে হয়। কিন্তু এ-পরিবারে কালীপূজা সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরে হয়। আগে কেবল মোমবাতির আলোয় বা প্রদীপের আলোয় পূজা হত। কোনও জোরালো আলো নিষিদ্ধ ছিল। এখনও মোমবাতির আলোয় পূজা সম্পন্ন হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে বাতি দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হয়। পূজায় বলিদান প্রথা প্রথম থেকেই চলে আসছে। যতক্ষণ বলি না হয় ততক্ষণ আতসবাজি পোড়ানো বন্ধ থাকে। বলি হয় নাটমন্দিরের সম্মুখে ছোট্ট মাঠে। অমাবস্যার রাতে পাটকাঠি জ্বালিয়ে বাড়ির সাতজন পুরুষ হাড়িকাঠ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই পাটকাঠির মশালের আলোয় বলি হয়। ছাগের কাটামুণ্ড দেবীর সম্মুখে ধরামাত্র বাজিপোড়ানো শুরু হয়। এঁরা কেবল কেনা বাজির উপর নির্ভর করেন না, পূজার আগে বাড়িতে বাজি তৈরি হয়, বিশেষ করে তুবড়ি!

মুখার্জি বাড়ি

কালীপূজাতেই এই গৃহদেবী বিশেষভাবে পূজিত হন। এছাড়া নিত্য দেবীর পূজা ও ভোগ সম্পন্ন হয়। পরিবারের মানুষজন মূল গৃহ থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লেও সকলেই দেবীপূজায় সামিল হতে ভালবাসেন। কেউ দূরে কোথাও গেলে দেবীকে প্রণাম করে যান। বিশেষ অনুষ্ঠানে এসে দেবীকে প্রণাম করেন সকলেই। কথিত, দেবীর পূজা সূচনার সময় মুখার্জি পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। দেবী স্বপ্নে জানালেন, কেবল বাতাসা মিষ্টান্নেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু পূজার বাসনপত্রও তো দরকার! দেবী চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, পূজার আগের দিন নাকি পূজার প্রয়োজনীয় সমস্ত বাসনপত্র পুকুরে ভেসে উঠত। পূজা শেষ হলে সেইসব বাসন পুকুরপাড়ে রেখে এলে কে যেন এসে নিয়ে যেত। এভাবে বহু বছর কেটেছে। কিন্তু একবার পুজোয় দেবীর প্রেরিত বাসনের মধ্য থেকে একটি বাসন চুরি যায়। দেবীকে সেটি আর ফেরত দেওয়া সম্ভব হল না। তার পরের বছর থেকে আর বাসন পাঠান না দেবী।

বিহারীলাল মুখার্জির সময় এই পরিবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কোনও দরিদ্র ছাত্র পড়াশোনার জন্য অর্থ বা দরিদ্র পিতা সন্তানের বিবাহদানের জন্য অর্থ যাচ্ঞা করে এ-বাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়ালে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম ছিল না। তখন পূজার বাসনের অভাব হয়নি পরিবারে। সেই সমৃদ্ধির দিনও অতীত, তবুও আজ সেই প্রাচীন দিনগুলিকে স্মরণ করে বহু উপচারের মধ্যেও মাটির সরা করে চিনি ও বাতাসা দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।

মুখার্জি পরিবারের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁদের মাথার উপর দেবী আছেন। তিনিই অভিভাবক। শোনা যায় বিহারীলাল মুখার্জি কোনও সময় অর্থকষ্টে পড়েন, কারণ তাঁর পিতা রামচন্দ্র খুব বড় পদে চাকরি করলেও (এ জি বেঙ্গলের অডিটর জেনারেল) অল্প বয়সে হঠাৎ মারা যান। খুব কষ্ট করে বিহারীলালকে বড় হতে হয়েছিল। একবার সামনেই দেবীপূজা, কিন্তু তাঁর হাতে বেশি টাকা ছিল না। কী করে পূজা করবেন সেই চিন্তা করতে করতে পাশেই একটি মুদির দোকানে উপস্থিত হন। পূজার জিনিস কিনতে এসেছেন শুনে দোকানি অবাক! ‘‘সে কী! এই কিছুক্ষণ আগেই তো একজন আপনাদের পূজার সমস্ত জিনিস কিনে দাম মিটিয়ে চলে গেল। আপনি চলে যান বাবু! সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে।’’ অবাক বিহারীলাল দ্রুত গৃহে ফিরলেন, সত্যিই বড় দালানের উপর সমস্ত দ্রব্য ঝুড়ি ভরে পড়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কে দিয়ে গেল? উত্তর এল—একটি কালোমতো মেয়ে, সাদা শাড়ি পরা। সকলে বুঝলেন এ মায়েরই লীলা।

বিহারীলাল ইংরেজি ভাল বলতে পারার সুবাদে ইংরেজদের সুনজরে পড়েন। কোলিয়ারিতে কাজ পান, শেষে ম্যানেজার পদে উন্নীত হন; পরে এজেন্সি নেন, রেলের ইস্টার্ন জোন কোলিয়ারির। উদার বিহারীলালের পোষ্য ছিল অনেক। পাঁচ ভাইয়ের সংসার। হাতে সোনার হাতল দেওয়া লাঠি নিয়ে বাবুগিরি করে বেড়াতেন অনেকে। কিন্তু বিহারীলাল অনেককেই পালন করতেন। পুজোর জন্য বাড়ির ভিতর দালানে গঙ্গার জল ভর্তি

পাঁচ-ছটি জালা রাখা থাকত। এখন থাকে দুটো। একবার পুজোর দিন সদর দরজায় এক ভিখারিনি ভিক্ষা চাইতে শুরু করল। সকলে ব্যস্ত, কেউ বিরক্তিভরে মেয়েটিকে তিরস্কার করে উঠল। ভিক্ষা না নিয়ে চলে গেল মেয়েটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটল এক অঘটন। সকলে দেখল অত বড় বড় পাঁচ-ছয় জালার বেশ কয়েকটিতে এতটুকু জল নেই। কোনওটির গা আপনা থেকেই ফুটো হয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সকলে বুঝল, ভিখারিনি সামান্য নন! কিংবা দেবীপূজার দিনে ভিক্ষে না দেওয়ার নিষ্ঠুরতায় ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেবী।

সত্তরের দশকের ঘটনা। একবার এক কালীভক্ত পূজারি কালীপূজার দিন পূজা সম্পন্ন করে ফুল বেলপাতার সঙ্গে ছোট্ট দেবীযন্ত্ররূপ দেবীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যান। ফুল-বেলপাতায় ছোট্ট দেবীযন্ত্র আবৃত থাকে। তাই সিংহাসনে যে দেবী নেই এটা কারও নজরে আসেনি। ব্যাপারটি জানাজানি হল পরদিন সকালে। পুরোহিত ছুটতে ছুটতে এসে দেবীকে ফেরত দিয়ে গেলেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, ''দেবীকে তো নিয়ে গেলুম কিন্তু সারারাত তিনি আমাকে নানা বিভীষিকা দেখিয়েছেন। দেবীকে আমার দরকার নেই, তোমাদের দেবী, তোমাদের গৃহেই থাক।'' এই পুরোহিতকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন অনেকেই এখনও আছেন।

মুখার্জি পরিবারের পাশে যে-ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন তাঁরাও খুব সমৃদ্ধ। এঁদেরও পরিবারে অবিকল একই ধরনের 'দেবীযন্ত্র' লাভের কাহিনি প্রচলিত আছে এবং সেখানেও দেবী যন্ত্রে পূজিত হন। দেবীর প্রাপ্তি সংক্রান্ত কাহিনি দুটি পরিবারের মধ্যে এত সাদৃশ্যযুক্ত হল কীভাবে? শিবপুর মন্দিরতলায় দুটি শিবমন্দির, বড় ও ছোট। ছোট শিবমন্দিরের কাছেই মুখার্জি পরিবারের গুরুবাড়ি। প্রতি বছর কালীপূজার পর এই গুরুবাড়িতে সিধা পাঠানোর রীতি ছিল, এখনও আছে। এই 'গুরুবাড়ি'কে কেন গুরুবাড়ি বলা হত—তা পরিবারের এখনকার সদস্যদের অজানা। তবে সিধে দেওয়ার প্রথা দেখে মনে হয় হয়তো এই 'গুরুবাড়ি' পূর্বে মুখার্জি পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। গুরুবাড়ির সদস্যরাও মুখার্জি পদবীর অধিকারী। পাশের পরিবারটি এই গুরুবাড়িরই একটি শরিক। রামচন্দ্র মুখার্জি একদিন বাগানে কাজ করতে গিয়ে পায়ে আঘাত পান, সেই থেকে গ্যাংগ্রিন হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর বাগানটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। এখানে সেই গুরুবাড়িরই এক শরিক দুলাল মুখার্জি বাড়ি তৈরি করেন। সুন্দরভবনের মুখার্জি পরিবারের অনেক পরে এঁরা এসেছেন, তাই দেবীলাভের মূল কাহিনিটি নিশ্চয়ই তাঁদের নয়। তাঁদের যন্ত্রলাভের পৃথক কাহিনি থাকাই স্বাভাবিক। এই দেবীর যন্ত্রে পূজিত হওয়ার ধারাটির মধ্যে তান্ত্রিক ভাবনার ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। গঙ্গাতীর, শিবমন্দির, ব্রাহ্মণপল্লি—এমন স্থানে কোনও মাতৃসাধকের আগমন হয়েছিল কি, যিনি হয়তো গুরুবাড়ি বা ছোট শিবমন্দিরের পাশের মুখার্জি পরিবারের সদস্য ছিলেন? তিনিই হাতে তুলে দিয়েছিলেন যন্ত্রে অঙ্কিত দেবীরূপ, যা গৃহদেবীরূপে প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছিলেন। ওই দেবীর মাহাত্ম্য কম ছিল না, কারণ নাটমন্দির সহ বেশ কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর বলে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ছিল। প্রাচীন পরিবারগুলিতে এই ধারা আমরা তখনই দেখি, যখন গৃহদেবতা গৃহের পরিধি ছাড়িয়ে সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। সুন্দরভবনের গৃহদেবীকে পূজা করেন এক পৃথক ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁরাও বংশপরম্পরায় পূজা করে আসছেন। সুতরাং একসময় খুবই সমৃদ্ধি নিয়ে এই দেবী গৃহে বিরাজিতা ছিলেন। আজও তাঁর বংশধরেরা দেবীকে তাঁদের অভিভাবিকা ও নিজেদের শাক্ত বলে মনে করেন।